ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1652-1658
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.386

পথের আহ্বান ও মায়ার বাঁধন: বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু

ড. নয়ন সরকার, *স্বাধীন গবেষক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The present research article seeks to unveil a new and deeper layer of meaning in Pather Panchali, the timeless novel by Bibhutibhushan Bandyopadhyay. While the novel has traditionally been interpreted as a melancholic narrative set in a rural backdrop, the central argument of this paper proposes that the "path" (pather) is not merely a physical route or inert setting; rather, it emerges as an autonomous, conscious, and sovereign entity. The philosophical foundation of this study rests upon the narrative seed— "the path chooses the traveler."

At the outset, the paper demonstrates that this "path," as conceived by Bibhutibhushan, is profoundly detached and selective. The primary condition for responding to its call is complete liberation from worldly attachments or maya. The study evaluates the disappearance (death) of characters through this lens of detachment. The deaths of Indir Thakrun and Durga are not treated as accidental tragedies; instead, they are interpreted as inevitable consequences of being rejected by the "path" due to their lingering attachment to decaying material possessions and a desire for static shelter. Durga's "box of trinkets" becomes a symbolic representation of worldly attachment, binding her to the roots of the earth and preventing her from merging with the larger flow of movement.

Subsequent sections analyze the deaths of Harihar and Sarbajaya, alongside Apu's survival, within an existential framework. Drawing upon critical interpretations, the paper suggests that Sarbajaya's maternal affection attempted to confine Apu within a safe and familiar orbit, which stood in opposition to the free development of his artistic self. Thus, the sovereignty of the "path" gradually severs all emotional bonds surrounding Apu, transforming him into an aniket—a rootless, homeless being.

In a comparative literary context, Apu's great departure is positioned alongside figures such as Siddhartha from Siddhartha by Hermann Hesse, and Stephen Dedalus from A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce. Ultimately, the study concludes that in Bibhutibhushan's philosophy, death is not an end but a cosmic transformation. The apparent cruelty of the "path" reflects a deeper artistic responsibility—one that liberates

Apu from the trivialities of domestic life and transforms him into a traveler on an eternal and indestructible journey.

Thus, Pather Panchali is not merely a tale of separation, but an eternal hymn to the triumph over attachment and the onward movement toward the infinite.

Keyword: Pather Panchali, Path as Conscious Entity, Maya and Detachment, Existential Journey, Bibhutibhushan Bandyopadhyay

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকালোত্তীর্ণ শিল্পকীর্তি ‘পথের পাঁচালী’ কেবল গ্রাম-বাংলার নিসর্গশোভা কিংবা দারিদ্র্যের সংক্ষুব্ধ আখ্যান নয়; বরং এটি মহাকালের অমোঘ প্রবহমানতার এক শাশ্বত আখ্যান। সাধারণ পাঠে এই উপন্যাসকে প্রকৃতির প্রশস্তি বলে মনে হলেও, এর অন্তঃসলিলা ধারায় প্রবাহিত হয় এক নিগূঢ় ও অনাসক্ত জীবনবীক্ষা। এই দর্শনের কেন্দ্রে সক্রিয় হয়ে আছে ‘পথ’—যা একটি ধূলিধূসর জড় পটভূমি ও এক স্বয়ংসম্পূর্ণ, নির্বাচক এবং সার্বভৌম চেতনা। প্রচলিত ধারণায় পথিক পথকে নির্বাচন করে, কিন্তু বিভূতিভূষণের শিল্প-ভুবনে এই সত্যটি সম্পূর্ণ বিপরীত—এখানে পথই তার যোগ্য যাত্রীকে খুঁজে নেয়। এই জীবন-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে ‘মৃত্যু’ এখানে কোনো আকস্মিক বিয়োগান্তক বিপর্যয় হিসেবে আসে না, তা আসে মায়ামুক্তির এক অনিবার্য শর্ত হিসেবে। মানুষের অস্তিত্ব যখনই কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডি, বস্তুগত সঞ্চয় কিংবা সম্পর্কের নিবিড় মায়াজালে স্থবির হয়ে পড়েছে, তখনই ‘পথ’ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইন্দির ঠাকরুনের জীর্ণ আশ্রয়লিপ্সা কিংবা দুর্গার কড়ির বাক্সে সঞ্চিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তুচ্ছ জিনিসের প্রতি আসক্তি—এসবই ছিল গতির পথে একেকটি অন্তরায়। প্রখ্যাত সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মতে, বিভূতিভূষণের এই পথ কেবল সুন্দরের আকর নয়, তা এক নির্লিপ্ত ও কঠোর শক্তি। এই শক্তিই নিরন্তর ছেঁটে ফেলেছে সেইসব চরিত্রকে, যারা চলিষ্ণু হতে শেখেনি। দুর্গা কিংবা সর্বজয়ার প্রস্থান তাই কোনো নিছক রিক্ততার শোকগাথা নয়, বলা যায় অপুর ‘বিশ্বপথিক’ হয়ে ওঠার পথে অপরিহার্য এক আধ্যাত্মিক রিক্ততা। অপু এখানে এক ‘অনিকেত’ সত্তার প্রতীক, যার পাথেয় কোনো স্থাবর সম্পত্তি নয়, বরং বিচ্ছেদজাত পরিশুদ্ধ স্মৃতি। ‘মায়ার বাঁধন’ বনাম ‘পথের আহ্বান’—এই দুই মেরুর টানাপোড়েনেই উপন্যাসের কুশীলবদের প্রাক-নির্দিষ্ট জীবনলিপিতে গ্রথিত হয়েছে। যে মায়ার শিকল ছিঁড়তে পারেনি, পথ তাকে স্থবিরতার অন্ধকারেই অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদন করেছে; আর যে সর্বস্ব হারিয়েও পথের বাঁশিতে মহাকালের ইশারা শুনতে পেয়েছে, পথ তাকেই আপন করে নিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট যে ‘পথের পাঁচালী’র মৃত্যুগুলো আসলে এক একটি সুচিন্তিত প্রস্থান, যা অপুর শিল্পীসত্তাকে মায়ার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে এক অন্তহীন ও আদিগন্ত বিস্তৃত গতির অভিমুখ দান করেছে।

এই জীবন-মহাকাব্যে ইন্দির ঠাকরুন ও দুর্গা কেবল দুটি জাগতিক অবয়ব মাত্র নন; বরং তাঁরা পার্থিব আসক্তি ও মর্ত্যের মমত্বের এক একটি নিবিড় ও ঘনীভূত অভিপ্রকাশ। পথ যখন কাউকে খুঁজে নেয়, তখন তার প্রথম শর্তই হয় নিরাসক্তি। কিন্তু এই দুই চরিত্রের অস্তিত্বের এই অন্তঃসলিলা প্রবাহকে ব্যবচ্ছেদ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা কোনো এক অদৃশ্য মায়ার নোঙরে নিজেদের আটকে ফেলেছিলেন, যা তাঁদের ‘পথের’ সচল গতির পরিপন্থী ছিল। ইন্দির ঠাকরুনের অস্তিত্ব ছিল তাঁর পৈতৃক ভিটের জীর্ণ একচিলতে দাওয়ায় ও তাঁর অতি সামান্য কিছু তৈজসপত্রের মধ্যে। এই ‘অধিকারবোধ’ এবং ‘আশ্রয়লিপ্সা’ তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষভাবে অনুধাবনীয় যে, ঔপন্যাসিক তাঁকে তখনই জীবন-মঞ্চ থেকে অপসৃত করলেন, যখন তাঁর এই মায়া অপমানের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাল। সর্বজয়ার গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েও যখন তিনি বারবার সেই একই ভিটের মায়ায় ফিরে আসছিলেন, তখন তাঁর এই অনড় অবস্থান মহাজীবনের গতিময়তাকে অন্তরিত করছিল। তাঁর মৃত্যু তাই কেবল জরাগ্রস্ত শরীরের অবসান নয়, বরং এক স্থবির

আসক্তির বিলোপ। বিভূতিভূষণ তাঁকে বনের প্রান্তে প্রকৃতির উন্মুক্ত অবারিত পথে ঠাঁই দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, যে গৃহ তাঁকে ধারণ করতে পারেনি, সেই গৃহের মায়া ত্যাগ করাই ছিল তাঁর মুক্তির একমাত্র পথ। আবার দুর্গা চঞ্চল ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর সেই চঞ্চলতা ছিল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও মানসিক বৃত্তের মধ্যে। তাঁর সেই 'কড়ির বাক্স' বা তুচ্ছ জিনিসের সংগ্রহ ছিল তাঁর পার্থিব মোহের প্রতীক। অপু যেখানে অজানার আহ্বানে উন্মুখ, সেখানে দুর্গা ব্যস্ত বনের ফলমূল বা কাঁচের চুড়ি দিয়ে নিজের একটি ক্ষুদ্র জগত সাজাতে। তাঁর এই সংগ্রহ করার নেশা তাঁকে নিশ্চিন্দিপুরের মাটির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। রেলপথ দেখার তীব্র বাসনা সত্ত্বেও দুর্গা সেখানে পৌঁছাতে পারেনি, কারণ তাঁর পা ছিল মায়ার শেকলে বন্দি। ঔপন্যাসিক সতর্ক সংবিৎ সহকারে দুর্গাকে সরিয়ে দিলেন, কারণ দুর্গা বেঁচে থাকলে অপু কোনোদিনও সেই মায়ার গণ্ডি পেরিয়ে বাইরের পৃথিবীর নাগরিক হয়ে উঠতে পারত না। দুর্গার মৃত্যু আসলে অপুর শৈশবের সেই 'আবদ্ধ মায়া'র মৃত্যু, যা অপুকে সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হয়ে পথের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ করে দিল। বিভূতিভূষণ এখানে একজন নিস্পৃহ বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি দেখেছেন, যারা ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে নিজেদের বন্দি করে ফেলেছে পথ তাদের আর বহন করতে আগ্রহী নয়। তাই 'পথের' সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতেই এই চরিত্রগুলোর প্রস্থান অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। পথের পাঁচালী-তে নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি কেবল একটি পটভূমি নয়, বরং এটি মায়ার এক ঘনীভূত রূপ। বাঁশঝাড়ের অন্ধকার, শেওলাধরা পুরনো ভিটে আর বন-জঙ্গলের নিবিড় ছায়া চরিত্রগুলোকে এক প্রকার অলস মায়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। এই জড় প্রকৃতিই প্রথম বাধা যা চিরন্তন গতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায়। বাঁশঝাড়ের নিভৃত ছায়াতলে ইন্দির ঠাকরুনের মহাপ্রয়াণ ঘটে; মনে হয় প্রকৃতি জননী যেন এক অমোঘ আকর্ষণে আপন জঠরেই তাকে চিরতরে আশ্রয় দান করলেন। নীলমণি রায়ের সেই পোড়ো ভিটেটি ছিল এক জীবন্ত মায়া, যা হরিহরকে বারবার ফিরে আসতে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু 'পথ' যখন অপুকে বেছে নিল, তখন সে প্রথমেই অপুর মন থেকে জড় প্রকৃতির সেই স্থাণুবৎ মায়া-বন্ধনকে ছিন্ন করল। প্রকৃতি যখন মায়ার বন্ধন হয়ে দাঁড়ায়, পথ তখন সেই চরিত্রকে প্রকৃতির লীনতায় পাঠিয়ে দিয়ে পথিকের যাত্রাপথকে ভারমুক্ত করে। প্রমথনাথ বিশীর মতে, 'এই প্রকৃতি যেমন একদিকে আশ্রয় দেয়, অন্যদিকে সে ঘরমুখো মানুষকে অচল করে রাখে। অপুর ক্ষেত্রে আমরা দেখি, সে এই প্রকৃতির রূপমুগ্ধ হলেও এর মোহে বন্দি হয়নি, বরং এই বন-পাহাড়ের ওপারেই সে খুঁজে পেয়েছে অজানার ডাক'।

পথ কেবল শৈশব বা কৈশোরের মায়া ছেঁড়ে না, বরং তা রক্তমাংসের সম্পর্কের যে গভীরতম শিকড়— মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব— তাকেও ছিন্ন করে। হরিহর ও সর্বজয়া চরিত্র দুটির প্রস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁরা দুজনেই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় অপুর 'পথের যাত্রী' হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হরিহর ছিলেন আজীবন এক আশাবাদী মানুষ, কিন্তু তাঁর সেই আশা ছিল একটি নির্দিষ্ট 'স্থিতি'র ওপর নির্ভরশীল। তিনি বারবার গ্রাম ছেড়ে বাইরে গিয়েছেন অর্থ উপার্জনের জন্য, কিন্তু তাঁর মনের অবচেতন স্তরে কাজ করত নিশ্চিন্দিপুরের সেই ভাঙা ভিটে মেরামত করে পুনরায় সেখানে থিতু হওয়ার এক প্রবল মোহ। একে আমরা বলতে পারি 'প্রত্যাবর্তনের মায়া'। হরিহর যখনই কিছু অর্থ উপার্জন করে ভাবলেন এবার তিনি সংসারকে একটি স্থায়ী রূপ দেবেন এবং অপুকে সেই পৈতৃক ভিটের কক্ষপথে আটকে দেবেন, তখনই লেখক তাঁকে সরিয়ে দিলেন। এখানে হরিহরের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা নয়; বরং পথ যখন দেখল যে হরিহরের এই 'সুদিনের মরীচিকা' অপুকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্দিপুরের জীর্ণতায় আবদ্ধ করে ফেলবে, তখনই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটল। হরিহরের মৃত্যু অপুকে কাশীর মতো এক মহাজীবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রসারিত করল, যেখানে তার বিকাশের পরিধি আর গ্রাম্য গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রইল না। সর্বজয়া অপুর চারপাশে এক নিবিড়

স্নেহের গণ্ডি টেনে দিয়েছিল। সে চেয়েছিল অপুকে সেই গ্রাম্য জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ধরে রাখতে। কিন্তু মহাকালের রথচক্র সেই মমতার বাঁধন চিনে নেয়নি। সর্বজয়া চরিত্রটি মায়ার সবচেয়ে জটিল এবং শক্তিশালী রূপ। তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব ছিল অপুকে ঘিরে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, সর্বজয়ার এই ভালোবাসা ছিল 'সংরক্ষণশীল'। তিনি চেয়েছিলেন অপুকে নিজের চোখের সামনে আগলে রাখতে, তাকে একটি নিরাপদ ও পরিচিত বলয়ের নিশ্চলতায় আবদ্ধ রাখতে। তিনি অপুর উচ্চশিক্ষা বা অজানার পথে যাত্রাকে নিজের একাকীত্বের পথে বাধা হিসেবে দেখেছিলেন। সর্বজয়া হলেন সেই চূড়ান্ত 'নোঙর', যা অপুর জীবনতরণীকে মাঝদরিয়ায় ভাসতে দিচ্ছিল না। বিভূতিভূষণ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে এই নোঙরটি উপড়ে ফেললেন। সর্বজয়া যখন কাশীতে গিয়েও অপুর সান্নিধ্য এবং অস্তিত্বের সমগ্র নির্যাস বাজি রাখলেন, তখনই লেখক তাঁর প্রস্থান নিশ্চিত করলেন। কারণ, সর্বজয়া বেঁচে থাকলে অপু কখনোই বিশ্বপথিক হতে পারত না; সে কেবল একজন দায়িত্বশীল পুত্র হিসেবে নিজের ডানা ছেঁটে ফেলত। সর্বজয়ার মৃত্যু অপুকে মানসিকভাবে 'অনাথ' করলেও তাকে জাগতিকভাবে 'স্বাধীন' করে দিল। আখ্যানে অপু এক 'অনিকেত' বা ঘরহীন সত্তার প্রতীক। পথ আমি খুঁজি না, পথ আমায় খোঁজে অপুর এই ঠিকানাহীন ভবঘুরে বৃত্তির মধ্যেই সার্থকতা পায়। জাঁ-পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শনে মানুষ যেমন কোনো পূর্বনির্ধারিত পরিচয়ে আবদ্ধ থাকে না, অপুর অস্তিত্বও তদ্রূপ কোনো ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় শৃঙ্খলিত নয়। সর্বজয়া বা হরিহর চেয়েছিলেন অপুকে একটি সামাজিক ও পারিবারিক ছাঁচে গড়ে তুলতে, কিন্তু পথের সার্বভৌমত্ব সেই প্রচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করে দেয়। অপুর প্রিয়জনদের মৃত্যু আসলে তার চারপাশের সেই দেয়ালগুলোকে ভেঙে ফেলা, যা তাকে একটি সংকীর্ণ গৃহকোণের আধারে সীমাবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। ঘরের মায়া যখন অপুকে স্পর্শ করতে পারল না, তখনই সে প্রকৃত অর্থে 'বিশ্বপথিক' হয়ে উঠল। এই নিঃসঙ্গতা অপুর জন্য কোনো অভিশাপ নয়, বরং এটি সেই স্বাধীনতা যা পথ তাকে উপহার দিয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, অনেক সময় শুভাকাঙ্ক্ষী বা অভিভাবকত্বের মায়াও জীবনের বৃহত্তর অগ্রগতির পথে বিঘ্ন ঘটায়। পথ যখন অপুকে খুঁজে নিল, তখন সে একে একে সেই সব মানুষদের সরিয়ে দিল যারা অপুর পায়ে ভালোবাসার শিকল পরাতে চেয়েছিল। হরিহর ও সর্বজয়া সেই মায়ার প্রতীক বলেই পথের অমোঘ নিয়মে তাঁদের মহাপ্রস্থান অনিবার্য হয়ে উঠল।

এই উপন্যাসে বিভূতিভূষণ একটি সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর পার্থক্য দেখিয়েছেন— তা হলো 'স্মৃতি' এবং 'মায়ার' মধ্যে পার্থক্য। দুর্গা যে কড়ির বাক্স বা তুচ্ছ স্মৃতিচিহ্নের এক বিষণ্ণ সম্ভার রেখে গিয়েছিল, তা ছিল জড়বস্তুর প্রতি আসক্তি বা 'মায়া'। দুর্গার মৃত্যুর পর অপু যখন সেই বাক্সটি বনের ঝোপে ফেলে দেয়, তখন সে আসলে দুর্গার সেই লৌকিক আসক্তিকে অতিক্রম করে। কিন্তু অপু কি দুর্গার স্মৃতিকে ভুলে যায়? না। অপু সেই স্মৃতিকে বহন করে নিয়ে যায় নিজের হৃদয়ে। এখানেই পথের আসল কারসাজি। পথ আমাদের কাছ থেকে 'বস্তু' কেড়ে নেয়, কিন্তু 'স্মৃতি' কেড়ে নেয় না। দুর্গা, ইন্দির ঠাকরুন বা সর্বজয়া—এঁরা যখন মারা যান, তখন তাঁরা অপুর কাছে আর কোনো 'বোঝা' থাকেন না, বরং তাঁরা হয়ে ওঠেন অপুর পথচলার 'পাথেয়' বা প্রেরণা। অপুর এই শিল্পী-সত্তার উন্মেষের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল বিচ্ছেদজাত এক ধরণের রিক্ততা, যা স্মৃতির সুধায় পূর্ণ। যারা মায়ার বশবর্তী হয়ে বস্তুকে আঁকড়ে ধরেছিল, তারা হারিয়ে গেল; কিন্তু অপু স্মৃতিকে পাথেয় করে পথের আহ্বানে সাড়া দিল। এই 'স্মৃতির পরিশুদ্ধি' অপুকে সাধারণ মানুষ থেকে একজন কালজয়ী শিল্পী বা দ্রষ্টায় রূপান্তরিত করেছে।

উপন্যাসের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রূপক হলো রেললাইন এবং ট্রেনের সেই সুদূরগামী বাঁশি। 'পথের সেই ডাক' যা কেবল উপযুক্ত পথিকই শুনতে পায়। দুর্গা রেললাইন দেখতে চেয়েছিল এক প্রকার কৌতূহল

থেকে, কিন্তু তার মনে পথের সেই দার্শনিক ডাক পৌঁছায়নি; তাই সে মাঝপথেই মায়ার টানে থেমে গেল। অন্যদিকে, অপুর শ্রুতিমূলে সেই ধ্বনি মহাকালের এক গূঢ় সংকেত রূপে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ট্রেনের বাঁশি অপুকে প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দিয়েছে যে, তার অভিসার নিশ্চিন্দিপুরের ঝোপঝাড়ের ক্ষুদ্রতায় নিবদ্ধ নয়, বরং এক আদিগন্ত বিস্তৃত রহস্যময় বিশ্বচরাচরে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র দর্শনের মতো এখানেও 'গতি'ই হলো সত্য, আর 'স্থিতি' হলো মায়া। ট্রেনের সেই ধূসর ধোঁয়া আর কম্পন অপুর ভেতরের মায়াবদ্ধ সত্তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যার অনিবার্য সার্থকতা আমরা প্রত্যক্ষ করি তার নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগের মাহেন্দ্রক্ষণে।

অপুর এই নির্লিপ্ত জীবনচেতনা ও পথের দুর্নিবার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে বিশ্বসাহিত্যের কতিপয় চিরায়ত চরিত্রের সারিতে বিন্যস্ত করা যায়। হারম্যান হেসের 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের নায়ক যেমন সত্তার গহন মুক্তি-তৃষ্ণায় ঘর, পরিজন এবং পার্থিব প্রেমের মায়া বিসর্জন দিয়ে নদীর অবিনাশী প্রবাহের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন, বিভূতিভূষণের অপুও তেমনি নিশ্চিন্দিপুরের চেনা গণ্ডি পেরিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। হেসের দর্শনে নদী যেমন গতির প্রতীক, বিভূতিভূষণের কাছে 'পথ' ঠিক তেমনই এক সক্রিয় সত্তা। আবার জেমস জয়েসের স্টিফেন ডিডালাস যেভাবে শিল্পী হয়ে ওঠার তাগিদে ধর্ম, দেশ ও পারিবারিক আসক্তির নিগড় মোচন করেছিলেন, অপুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় সেই একই 'নিস্পৃহ বিচ্ছেদ'। পার্থক্য কেবল এই যে, জয়েসের নায়ক সচেতনভাবে নির্বাসন বেছে নেন, আর অপুর ক্ষেত্রে তার জীবনের প্রতিটি মায়ার নোঙরকে পথ নিজেই সচেতনভাবে উপড়ে ফেলে। অপুর এই পথ চলা কোনো আকস্মিক বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং তা বিশ্বসাহিত্যের সেই চিরন্তন মহাযাত্রারই অংশ, যেখানে মায়ার বিনাশই হলো নবজন্মের একমাত্র শর্ত।

পথের পাঁচালী'র এই মহানিষ্ক্রমণের আখ্যানে আর একটি বিশেষ দিক হলো স্মৃতির ভূমিকা। অপু যখন নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে অজানার এক অলঙ্ঘ্য অভিসারে নির্গত হয়, তখন সে কেবল রিক্ত হাতে বের হয় না; বরং তার অন্তরে অক্ষয় হয়ে থাকে দুর্গার স্মৃতি, সর্বজয়ার স্নেহ আর অপূর্ণ শৈশবের হাজারো বিষণ্ণ মুহূর্ত। বিভূতিভূষণের দর্শনে স্মৃতি কেবল অতীতের রোমন্থন মাত্র নয়; এ তো চির-পথিকের এক পাথেয় সঞ্চয়। পথের দেবতা অপুর কাছ থেকে সব কেড়ে নিলেও তাকে এক গভীর সংবেদনশীল হৃদয় দান করেছেন, যা দিয়ে সে মহাকালের নিঃশব্দ পদধ্বনি শুনতে পায়।

এখানেই বিভূতিভূষণের সাথে আধুনিক অস্তিত্ববাদী লেখকদের একটি এক সুগভীর ও গুণগত পার্থক্যের বাতাবরণ রচিত হয়। যেখানে পাশ্চাত্য দর্শনে একাকীত্ব প্রায়শই হতাশা বা শূন্যতার নামান্তর, সেখানে অপুর এই নিঃসঙ্গতা একধরণের অলৌকিক ব্যাপ্তি। প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন যে, প্রকৃতি একদিকে যেমন মানুষকে বেঁধে রাখে, অন্যদিকে সে-ই আবার মুক্তির পথ দেখায়। অপুর ক্ষেত্রে নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি আর মানুষের মৃত্যু তাকে জীবনবিমুখ করেনি, বরং এক বৃহত্তর জীবনের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে। দুর্গার মৃত্যু তাকে শিখিয়েছে যে, জীবন নশ্বর কিন্তু জীবনের প্রবাহ অবিনাশী। তাই অপুর ঘর ছাড়া কোনো পলায়ন নয়, বরং তা হলো খণ্ড জীবন থেকে অখণ্ড জীবনের দিকে এক সাহসী অভিযাত্রা। মহাকালের রথচক্র সব মায়ার বাঁধন গুঁড়িয়ে দিলেও সেই ধুলো থেকেই জন্ম নেয় এক নতুন শিল্পীসত্তা, যে চিরকাল পথের বাঁশিতে সুর বেঁধে চলে।

'পথের আহ্বান ও মায়ার বাঁধন: বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু' শীর্ষক এই আলোচনার শেষে আমরা এক অনিবার্য ও ধ্রুব সত্যের মুখোমুখি হই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' কেবল এক পল্লী-বালকের বেড়ে ওঠার কাহিনী নয়; এ আখ্যান মায়া ও মুক্তির এক চিরন্তন মহাকাব্যিক বয়ান। সমগ্র

প্রবন্ধের নিহিতার্থ ও নিবিড় বিশ্লেষণে এই সত্যটি প্রতিভাত হয় যে, নিশ্চিন্দিপুরের সেই ধূলিধূসর পথ কোনো জড় রেখা নয়, বরং তা এক জীবন্ত ও আধ্যাত্মিক সত্তা। এই পথ যাকে আহ্বান করে, তাকে নিঃস্ব করেই বরণ করে নেয়। পথের সেই অলঙ্ঘ্য আহ্বান যাঁদের মরমী চেতনাকে স্পর্শ করেছে, তাদের চেনা ঘর, চেনা মানুষের ভিড় আর সঞ্চিত মায়ার সংসার থেকে ছিন্নমূল হতেই হয়েছে। আমরা দেখেছি, ইন্দির ঠাকরুন কিংবা দুর্গার প্রস্থান কেবল প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর নিয়ম নয়; একে 'পথের' এক সচেতন নির্বাচন হিসেবেই গণ্য করা যায়। দুর্গার সেই 'কড়ির বাক্স' কিংবা সর্বজয়ার 'স্নেহের গণ্ডি' এই সবকিছুই ছিল অপুর চিরন্তন গতির বিপরীতে এক একটি স্থবির মায়াবন্ধন। মহাকালের রথচক্র সেইসব স্থবিরতাকে চূর্ণ করে অপুকে এক মুক্ত প্রান্তরের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন আভাস দিয়েছেন, অপুর এই নিঃসঙ্গতা আসলে তার রিক্ততা নয়, বরং এক পরম পূর্ণতা। এই রিক্ততাই তাকে সাধারণের গণ্ডি ছাড়িয়ে একজন 'বিশ্বপথিক' ও 'শিল্পী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মায়া যাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আচ্ছন্ন করেছিল, মৃত্যু তাকে মুক্তি দিয়েছে; আর যে মৃত্যুকে পাথেয় করে স্মৃতিকে সঙ্গী করেছে, পথ তাকে আপন করে নিয়েছে। যাবতীয় আলোচনার সূত্র ধরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিভূতিভূষণের জীবনদর্শন এক আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় ভাস্বর। তিনি দেখিয়েছেন, জীবন এক বহমান নদী, আর মৃত্যু সেই নদীরই এক বাঁক পরিবর্তন। অপুর নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ কোনো পরাজয় নয়, বরং তা হলো মায়ার ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে এক মহিমান্বিত মহানিষ্ক্রমণ। পথের এই আহ্বান চিরন্তন—যা প্রতিনয়ত যোগ্য পথিককে খুঁজে নেয় এবং অযোগ্যকে ঝরিয়ে দেয়। 'পথের পাঁচালী'র এই জীবন ও মৃত্যুর আখ্যান তাই শেষ পর্যন্ত গতিরই জয়গান গায়। পথ যেখানে শেষ হয়েছে বলে মনে হয়, সেখান থেকেই আসলে এক নতুন দিগন্তের শুরু হয়—যেখানে পথিক একা, নিঃসঙ্গ, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর এই পথেরই আদি ও অন্তহীন মন্ত্র হলো—পথ পথিককে খোঁজে না, বরং পথই তার আজন্ম পথিককে খুঁজে নেয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আহমেদ, হুমায়ূন। বিভূতিভূষণ কেন বড় সাহিত্যিক (প্রবন্ধ সংকলন/বক্তব্য)। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।
২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। সাহিত্য ও সাহিত্যিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৬। পৃষ্ঠা ১১২-১১৫।
৩. ঘোষ, সাগরময় (সম্পাদক)। বিভূতি-স্মরণ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৪।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ছিন্নপত্রাবলী। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।
৬. দাশগুপ্ত, অলকরঞ্জন। শিল্পীর স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৪। পৃষ্ঠা ৪৫-৪৮।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পথের পাঁচালী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯২৯ (বর্তমান সংস্করণ ২০১০)। পৃষ্ঠা ৮২, ২১০-২১৫।
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুশতী সেন। আরণ্যক ও পথের পাঁচালী: একটি নির্লিপ্ত পাঠ। সিগনেট প্রেস, কলকাতা।
৯. বিশী, প্রমথনাথ। বিভূতিভূষণ ও পথের পাঁচালী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬২ (সংস্করণ ২০০৫)। পৃষ্ঠা ১৪-২০ এবং ১৮-২০।

১০. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাস। অক্ষয় লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৭০। পৃষ্ঠা ২৭৫-২৮০।

১১. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। বিভূতিভূষণ: মন ও সাহিত্য। সাহিত্যমণি, কলকাতা, ১৯৭৫। পৃষ্ঠা ৬২-৬৭।

১২. মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার। বিভূতি-মানস। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৮। পৃষ্ঠা ৯০-৯৪।

১৩. রাহা, অশোককুমার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লি।

১৪. সরকার, অলক। বিভূতিভূষণের শিল্পকলা। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮২।

১৫. সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৬. Campbell, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. Princeton University Press, 1949.

১৭. Eliot, T.S. Four Quartets. Faber and Faber, 1943.

১৮. Hesse, Hermann. Siddhartha. Translated by Hilda Rosner, New Directions, 1951.

১৯. Joyce, James. A Portrait of the Artist as a Young Man. B.W. Huebsch, 1916.